ঃ যোগাযোগ ঃ
প্রতাপ দীঘি লোক বিজ্ঞান সংস্থা, পূর্ব মেদিনীপুর, শোভনলাল সাহু - ৯৭৩২৬৮১১০৬, জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব ৯৪৭৪৪১৭১৭৮, শান্তিপুর সায়েন্স ক্লাব ৯২৩২৮২৮৩৩৩। কলিকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা- ৯৪৭৭৫৮৯৪৫৬

64

বিজ্ঞান অন্বেষক

ঃ যোগাযোগ ঃ
চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ৯৪৩৪১১০৯৬৯, ত্রিবেণী যুক্তিবাদী সংস্থা ৯৪৭৭০৬৪৭০৪, কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম ৯৬০৯৭৪২৯৯৭।

বর্ষ-১০ সংখ্যা - ৬ নভেম্বর-ডিসেম্বর/২০১৩ RNI No. WBBEN/03/11192 মূল্য : ২ টাকা

ভারতের বানর

ভারতে বানর বা বাঁদর (Monkey) অতি পরিচিত নাম সেই অতীতকাল থেকেই।হিন্দু পুরাণ সহ রামায়ণ মহাকাব্যেও বানরের মায়াবি কান্ডের উল্লেখ আছে। আজও সাধারণ মানুষ বানরদের প্রতিনিধি রামভক্ত শ্রেষ্ঠ বানর হনুমানকে দেবতারূপেই পুজো অর্চনা করে। হিন্দু পুরানে হনুমানকে শিবের একটি রূপ হিসেবে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তাই বানরের সাথে আমরা গভীরভাবেই সম্পর্কযুক্ত প্রাগৈতিকহাসিককাল থেকে। আজও বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানে বানরের উপস্থিতি এই মতকে জোরালোভাবে সমর্থন জানায়।

দিন দিন এদের সংখ্যা কমে যাওয়ায় ভারতে আজ এরা বিপন্ন।

সাধারণ বানর মানুষের মত প্রাইমেটবর্গের একটি মাত্র গোত্র'র অধীনে দুটি উপ-গোত্রের অন্তর্গত। এই দুটি উপ-গোত্র হল— 'Ceropithecinae' যার অধীনে সমস্ত মাকাক্ বা সাধারণ বানর পড়ে এবং অপরটি হল Colobinae' যার অধীনে সমস্ত লাঙ্গুর বা হনুমান বানর পড়ে।

এছাড়া আরও কিছু বানর জাতীয় প্রাণী আছে যাদের আমাদের অতিপরিচিত বানরদের সাথে অমিল থাকলেও এরাও বানর গোষ্ঠীর মধ্যেই পড়ে। এরা প্রাইমেট্ বর্গের অধীনে সম্পূর্ণ আলাদা উপবর্গের অন্তর্গত ভারতে একমাত্র আদি মানব জাতীয় বানর — গিবন বা উল্লুক এবং 'Lorisidae' গোত্রের অধীনে ভারতে প্রাপ্ত মাত্র দুটি প্রজাতির বিশেষ বানর— লজ্জাবতি বানর এবং ছোট লজ্জাবতি বানর উল্লেখযোগ্য।

ভারতে প্রাপ্ত ১৯টি প্রজাতির বানরের মধ্যে এই মুহূর্তে ১৫টি প্রজাতির দেখা মেলে যার মধ্যে ১২টি প্রজাতির অবস্থা মোটেও ভালো নয়।

এদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ

সাধারণ বানর (Rhesus Monkey)

Macaca mulatta বা সাধারণ বানর দেখতে মোটামোটা। গায়ের রঙ পাটের মত। কোন কোনটির মুখ ও পেছন দিক লাল। উচ্চতায় এরা ৬০ সে.মি থেকে ৬৫ সে.মি এবং ওজন ৪ থেকে ১০ কিলোগ্রাম।

দক্ষিণ ভারত ছাড়া ভারতের প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায় এরা। হিমালয়ের

এরপর 2 পাতায়

শূন্য কাহিনি

পৃথিবীর গণিত ইতিহাসে ভারতের সর্বোত্তম অবদান, সর্বকালের সর্বদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিত কীর্তি হলো শূন্য (Zero) সংখ্যাটি এবং দশমিক স্থানীয় মান অঙ্ক পাতন পদ্ধতি (decimal place-value) আবিষ্কার। শূন্য আবিষ্কর্তা হিসাবে বিশ্ব বিজ্ঞানের ইতিহাসে হিন্দুরা চিরস্মরণীয় হওয়ার অধিকারী। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ফ্রীবেরী তাঁর এ হিস্ট্রী অফ ম্যাথম্যাটিকস গ্রন্থে লিখেছেন "...how important 'nothing' really is! It has been said that introduction of zero as a definite part of a number system marks one of the most important developments in the whole history of mathematics... The second great contribution of the Hindus was that of a decimal place notation...we can only emphasize once again that the introduction of zero and the use of a decimal place notation really set mathematics free,..." পরবর্তীকালে আমরা দেখছি, ভারত তথা বিশ্বের গণিত তথা সমগ্র বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার পক্ষে এই দুই আপাত ক্ষুদ্র, অতি মৌলিক আবিষ্কারের ফল অত্যন্ত ব্যাপক এবং গভীর। কিভাবে, কবে আবিষ্কার হল শূন্য সে প্রসঙ্গে পরে আসি।

এখন দেখে নেই, জিঅ্যারো (Zero) শব্দটি এল কোথা থেকে। ইংরেজি Cipher বা Cypher

এরপর 3 পাতায়

সিক বিল্ডিং সিনড্রোম

আধুনিক ফ্ল্যাট বাড়ি আর আমাদের আরাম-আয়াসের জীবন-যাপন, এই দুই অভ্যাসের যুগলবন্দিতে তৈরি হচ্ছে ইনডোর পলিউশন, ডেকে আনছে ভয়ানক স্বাস্থ্য সমস্যা। ঠিকমতো ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা না থাকার কারণে আধুনিক ফ্ল্যাটবাড়ির ঘরগুলোও অনেক সময় হয়ে উঠছে ইনডোর পলিউশনের প্রধান কারণ। এর ফলে দেখা দিচ্ছে নানা ধরণের রোগ, বিজ্ঞানীদের পরিচিত ভাষায় যা পরিচিত সিক বিল্ডিং সিনড্রোম (Sick Building Syndrome) নামে। বিভিন্ন রাসায়নিক উপস্থিতির কারণে ইনডোর পলিউশন এবং স্বাস্থ্যের ওপর তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিয়ে আজ গোটা বিশ্ব চিন্তিত। আলোচনা, গবেষণার আলোর বৃত্তে রয়েছে প্রধান তিনটি বিষয় - সিক বিল্ডিং সিনড্রোম (বা Sick House Syndrome), মাল্টি কেমিক্যালস সেনসিটিভিটিস (Multi

এরপর ৪ পাতায়

স্বাধীনোত্তর ভারতে আবিষ্কৃত পাখি

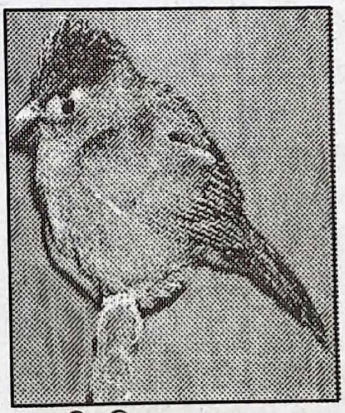

বুগুন লিওসিচলা
(Bugun liocichla)

এরপর আরও ছবি ৫ এর পাতায়

ভারতের বানর

1 পাতার পর

৪০০০ ফুট উচ্চতায় পাইনের জঙ্গলেও এদের দেখা মেলে।

সাধারণত কচি চারাগাছ, লতাপাতা, কীটপতঙ্গ, মাকড়াসা প্রভৃতি খায় এরা। ভারতে এদের তিনটি উপ-প্রজাতি (Race) পাওয়া যায়। এরাই সবচেয়ে মানুষের কাছাকাছি মুক্ত জায়গায় (ধর্মীয় স্থান, রেল স্টেশন প্রভৃতি) থাকতে ভালোবাসে। আবার মানুষ সবচেয়ে বেশী পরিমাণে এদেরকেই খাঁচা বন্দি করে তাদের বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে। ভারতের বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন, ১৯৭২ এর তপশীল-২ তালিকা ভুক্ত প্রাণী এরা।

বনেট্ বানর (Bonnet Macaque)

Macaca radiata বা বনেট্ বানরের লেজ এদের শরীরের থেকে অনেক লম্বা। লেজটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬০ সে.মি.। এদের মাথার মাঝখানে একটা সিঁথি আছে। সাধারণ বানরের চেয়ে আকারে এবং ওজনে এরা কিছুটা কম। একটি পূর্ণ বয়স্ক পুরুষের ওজন ৬ থেকে ৯ কিলোগ্রাম এবং পূর্ণ বয়স্ক মহিলার ওজন ৩ থেকে ৪ কিলোগ্রাম হয়। সমগ্র দক্ষিণ ভারতেই এদের দেখা যায়— পশ্চিমে মুম্বই থেকে শুরু করে পূর্বে গোদাবরীর তীর পর্যন্ত ট্রাভ্যান্‌কোরে এদের একটি আলাদা উপ-প্রজাতি (Macaca radiata diluta) চিহ্নিত করা গেছে সম্প্রতি। এরাও বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন, ১৯৭২ এর তপশীল-২ তালিকাভুক্ত প্রাণী।

এক সাথে ২০-৩০টি বানর এক সাথে দলে থাকে। গাছে থাকতেই বেশী ভালোবাসে। অন্যান্য বানরের মত এরা সব কিছুই খায়। এরাই সবচেয়ে বেশী সামাজিক বানর।

অসমীয়া বানর (Assamese Macaque)

অসমীয়া বানর বা *(Macaca assamensis)* অনেকটা সাধারণ বানরের মত। তবে এদের মুখ ও পেছন দিক কখনই ঐ সাধারণ বানরের মত লাল হয় না। মাপে সাধারণ বানরের চেয়ে তুলনামূলক ভাবে বড় এবং ওজনে ১০ থেকে ১২ কিলোগ্রাম। এদের দুটি উপ-প্রজাতি চিহ্নিত করা গেছে।

উত্তরবঙ্গ, আসাম, অরুনাচল সহ উত্তর পূর্ব ভারতের বিভিন্ন বনাঞ্চলে এদের দেখা মেলে। আগে সুন্দরবনেও এদের দেখা যেত। এখন অবশ্য সুন্দর বনে লুপ্ত। হিমালয়ের ৬০০০ ফুট উচ্চতাতেও এদের দেখা মেলে। এদের খাদ্য তালিকা সাধারণ বানরের মত।

এরা অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির এবং ভীষণ ভীতু। বিশেষ ধরণের আওয়াজ সৃষ্টি করতে পারে এরা। সিকিম ও দার্জিলিং এবং পাহাড়ী বনাঞ্চলে এদের স্বল্প সংখ্যায় দেখা যায়। লেপচারা (পাহাড়ী আদিবাসী) খাদ্যের এবং পরম্পরাগত (traditional) ঔষধের জন্য এদের শিকার করে। এরাও ভারতের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, ১৯৭২ এর তপশীল -২ তালিকা ভুক্ত প্রাণী।

হ্রস্বপুচ্ছ বানর (Stumptailed Macaque)

হ্রস্বপুচ্ছ বানর (Macaca speciosa) আকৃতি, ওজন ও উচ্চতায় অসমীয়া বানরের সাথে খুব একটা পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু এক ইঞ্চির কম লেজ দেখে অন্যান্য বানরের সাথে। এদের খাদ্য অভ্যাসও অন্যান্য বানরের মতই।

সাধারণত ভারতের আসাম, অরুনাচল প্রদেশ, মেঘালয় সহ উত্তর পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অরণ্যে এদের দেখা যায়। এরাও বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন, ১৯৭২ এর তপশীল তালিকাভুক্ত প্রাণী।

সিংহপুচ্ছ বানর (Liontailed Macaque)

Macaca silenus বা সিংহপুচ্ছ বানরকে অন্যান্য যেকোন বানর থেকে খুব সহজেই পৃথক করা যায়। সাধারণত বানরের উচ্চতার সমান এই বানরটির গায়ের রঙ উজ্জ্বল কালো। কপাল থেকে গাল বেয়ে মুখের চারপাশে ঘন ছাই রঙের কেশর আছে অনেকটা পুরুষ সিংহের মত। এদের লেজটি লম্বায় প্রায় ২৫ সেমি ৪০ সেমি। লেজটির সাথেও সিংহের খুব মিল আছে তাই এদের সিংহ পুচ্ছ বানর বলে। এরা চির সবুজ, ক্রান্তীয় বনাঞ্চলে ২০০০ ফুট থেকে ৩৫০০ ফুট উচ্চতায় বসবাস করে। এরা এক সাথে ১২টি থেকে ২০টি সংখ্যায় থাকে। এদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট হল—পুরুষ বানরের শব্দ অনেকটা মানব আওয়াজের সাথে মিলে যায়। এরা জঙ্গলে প্রথমে 'কোয়ী' বা 'কেউ' (আছে নাকি?) পরে 'কু' (পায়রার মত) আওয়াজ করে।

পশ্চিমঘাট বনাঞ্চলের কেরল, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুতে এদের দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণ ভাবে ছোট শিশু বানরদের সেপ্টেম্বর মাসে দেখা যায়। বাসস্থান নষ্ট হওয়ার জন্য এবং শিকারের জন্য এদের অস্তিত্ব ভীষণ ভাবে সংকটে।

এরা ভারতের বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন, ১৯৭২ এর তপশীল-১ তালিকাভুক্ত প্রাণী। বস্তুতঃ এরাই ভারতীয় বানরের সবচেয়ে সংকটগ্রস্ত প্রজাতি।

শুকর পুচ্ছ বানর (Pigtailed Macaque)

Macaca nemestrina বা শুকরপুচ্ছ বানর ভারতের পাহাড়ী অঞ্চলের গভীর অরণ্যে পাওয়া যায়। লেজটি অনেকটাই খাড়া এবং দেখতে অনেকটা শুকরের লেজের মত, তাই সাধারণভাবে এই নামে ডাকা হয়ে থাকে।

নাগা আদিবাসীরা এদের খাদ্য ও বিভিন্ন প্রথাগত ঔষধের জন্য শিকার করে। যে কারণে, এদের সংখ্যাও দিন দিন কমে যাচ্ছে। এরা অন্যান্য বানরের মতই খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন, ১৯৭২ এর তপশীল-২ তালিকাভুক্ত প্রাণী এরা।

কাকড়াভুক্ বানর (Crab-Eating Macaque)

কাকড়াভুক্ বানর (*Macaca irusumbropa*) খুবই সীমিত সংখ্যায় ভারতের নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে দেখা যায়। এদের সম্বন্ধে এখনও অনেক তথ্যই অজানা। এদের খাদ্য তালিকায় প্রধান খাদ্য হল কাঁকড়া (Crab)। সাধারণভাবে দেখতে অনেকটাই সাধারণ বানরের মত। তবে আকৃতিতে খানিকটা ছোট। এরাও ভারতের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, ১৯৭২ এর তপশীল-২ তালিকাভুক্ত।

চশমা বানর (Spectacled Monkey)

Presbytis phayrei বা চশমা বানর আসলে এক ধরণের হনুমান বানর। আকারে সাধারণ হনুমানের মতই। এদের গায়ের রঙ কালচে বাদামী। এদের চোখ দুটির চারধার দিয়ে সাদা রিং আছে। অনেকটা চশমার মত। অনেক দূর থেকেও এই রিং চোখে পড়ে। তাই এই নামটি।

পৃথিবীর দুর্লভ বানরের একটি প্রজাতি এর। ভারতের একমাত্র ত্রিপুরার জঙ্গলেই এদের দেখা যায়। এরা সম্পূর্ণ রূপে নিরামিষভোজি; এদের খাদ্য তালিকায় বনের ফল, ফুল, কুঁড়ি, গাছের কচি ডগা ও পাতা প্রভৃতি রয়েছে। ভারতের বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন, ১৯৭২ এর তপশীল-১ এর তালিকাভুক্ত প্রাণী এরা।

সাধারণ হনুমান (Common Langur)

এরপর 3 পাতায়

ভারতের বানর

1 পাতার পর

Presbytis cntcilus বা সাধারণ হনুমান বা হনুমান বানর বা লাঙ্গুর যে নামেই ডাকা হোক না কেন প্রায় সারা ভারত জুড়েই এদের দেখা মেলে। এমনকি হিমালয়ের ১২,০০০ ফুট উচ্চতাতেও এদের দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণ বসা অবস্থায় এরা প্রায় ৬৫ সে.মি থেকে ৭৫ সে.মি উঁচু। এদের ওজন ১৫-২০ কিলোগ্রামের মতো। এদের গায়ের রঙ হাল্কা পাটের মত; কিছু জায়গায় সাদা এবং মুখ লোমহীন কুচকুচে কালো। এদের লেজ বেশ লম্বা। এরা বনের ফল, ফুল, কুঁড়ি, গাছের কচি ডগা, পাতা প্রভৃতি খায় বস্তুত: এরা সম্পূর্ণ রূপে নিরামিষভোজী। এদেরকে গ্রাম শহর থেকে শুরু করে বনেও দেখা মেলে। এরা অনেকগুলো (প্রায় ১৪টি) অঞ্চলভিত্তিক আলাদা জাতি আছে।

উত্তরের দিকে গায়ের রঙ একটু গাঢ় হলেও দক্ষিণ ভারতের দিকে লঘু বা সাদাটে ভাবযুক্ত হয়ে যায়। উত্তর ভারতে এদের একটি একটি দল ১৪-২৫টি করে সদস্য থাকলেও দক্ষিণ ভারতে দলে ১৫ এর বেশী থাকে না। বনে এদের প্রাকৃতিক শত্রু বলতে চিতাবাঘ এবং ডোরাকাটা বাঘ। এরা গাছে 'হুপ্' 'হুপ্' করে শব্দ করে। এদের গর্ভধারণ সময় আনুমানিক ৬ মাস। প্রতি দু'বছর বাচ্চা প্রসব করে। এরাও বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন, ১৯৭২ এর তপশীল-২ তালিকাভুক্ত প্রাণী।

টুপি হনুমান (Capped Langue)

টুপি হনুমান বা পাতা বানর (*Presbytis pileatus*) ভারতের প্রধানত আসামের বনাঞ্চলেই দেখা যায়। আসামের বিভিন্ন পাহাড়ী বনাঞ্চলে এদের আরও চারটি জাতি দেখা যায়।

সহজেই গায়ের রঙ দিয়ে এদের অন্যান্য হনুমান থেকে পৃথক করা যায়। এদের পিঠের দিক ঘন ছাই রঙের আবার অঙ্কীয় ভাগ, বিশেষ করে বাহু ও গাল কমলা বা সোনালী লাল রঙের হয়। এদের নবজাতক জন্মের সময় সোনালী, সোনালী লাল এবং চকোলেট সাদাটে হয়। এক্ষেত্রে অন্যান্য সমস্ত হনুমানের নবজাতকরা জন্মের সময় কালো হয়।

বসা অবস্থায় এদের উচ্চতা ৬০-৭০ সে.মি হয় এবং ওজন ১২-১৪ কিলোগ্রাম হয়। এদের মাথার লোমগুলো গুচ্ছাকারে পেছনের দিকে টুপির আকারে নিক্ষিপ্ত তাই এমন নামটি। সাধারণভাবে এরা গাছে থাকতেই বেশী ভালোবাসে। এদের সম্পর্কে এমন কথাও প্রচলিত আছে যে পারতপক্ষে জল খাওয়ার জন্য এরা মাটিতে নামতে চায় না; গাছের পাশ দিয়ে কোন ঝোড়া গেলে সেখান থেকেই তৃষ্ণা মেটায়। এছাড়া এরা শিশির এবং পাতার উপর বৃষ্টির ফোঁটা থেকেও জলের চাহিদা পূরণ করে। এদের খাদ্য অভ্যাস অন্যান্য হনুমানের মতই।

অনেক তথ্যই এখনও এদের সম্পর্কে অজানা। এরাও ভারতের বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন, ১৯৭২ এর তপশীল-২ তালিকাভুক্ত প্রাণী।

সোনালী হনুমান (Golden Langue)

সোনালী হনুমান (*Presbytis geei*) সাধারণ হনুমান মাপের এই হনুমানের গায়ের লোম হলদেটে সোনালী। ওজনে এবং উচ্চতায় এরা সাধারণ হনুমানের মত। সূর্যের আলোতে গায়ের রঙ অনেকটা সোনালী। এরা আসামের সংকোশ ও মানস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের অরণ্যে (মানস অভয়ারণ্য সমেত ভুটানের কিছু অংশে) পাওয়া যায়। এরাও সাধারণ হনুমানের মত খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। সাধারণ ভাবে দলে ৯ জন করে সদস্য থাকে যার মধ্যে একটি পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ, এক বা একাধিক মহিলা এবং বাকি ছোট ছোট শিশু সদস্য থাকে। ভারতের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন ১৯৭২ এর তপশীল ১ তালিকাভুক্ত প্রাণী এরা।

— লেখক রাজা রাউত, জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব। মোঃ-৯৪৭৪৪১৭১৭৮

শূন্য কাহিনী

1 পাতার পর

(সাইফা (র)) শব্দটি শূন্যের আরবি রূপ 'Sifr' থেকে সৃষ্ট। আর 'সিফর'-এর ইতালীয় রূপ 'Zefiro' থেকে সৃষ্টি হয়েছে প্রতীক (Symbol) 'O' (Zero)। বাংলায় শূন্য (0)।

গণিত তথা বিজ্ঞানের জগতে কত নামে ছড়িয়ে আছে শূন্য! প্রাচীন যুগে ভারতে সংস্কৃত ভাষায় 'খ', 'গগন', 'আকাশ', 'নভ', 'অনন্ত' শব্দগুলি শূন্য (কিছু নয় এমন) বোঝাতে ব্যবহার করা হতো। লিওনার্দো ফিবোনাচি (Leonardo Fibonacei) তাঁর 'লিবের আবাচী' (Liber Abaci) গ্রন্থে শূন্যকে 'Zephirum' বলে অভিহিত করেন। এই শব্দটি Zenero, zepiro, triphra, zephiro, cenro প্রভৃতি নামে পরিচিত হয়। শূন্যের আরো নাম আছে। যেমন, Sipos, tsiphron, zeron, cifra, rota, circulus, galgal, omicron, theca, null, figura, nihili, nought.

শূন্য কি? ১ এর ঠিক পূর্ববর্তী পূর্ণসংখ্যা (integer) শূন্য (zero, প্রতীক 0)। 2 দিয়ে শূন্য বিভাজ্য; তাই শূন্য একটি যুগ্ম সংখ্যা (even number)। সংখ্যা হিসাবে শূন্যের অবস্থান সংখ্যা রেখা (number axis)-এর মাঝখানে; এটি ধনাত্মক (positive) নয়, নয় ঋনাত্মক (negative)। শূন্য আছে ধনাত্মক সংখ্যা এবং ঋনাত্মক সংখ্যাগুলির ঠিক বর্ডার লাইনে। শূন্য নয় মৌলিক সংখ্যা (prime number), নয় যৌগিক সংখ্যা (composite number)। শূন্য বাস্তব (real), মূলদ (rational) সংখ্যা।

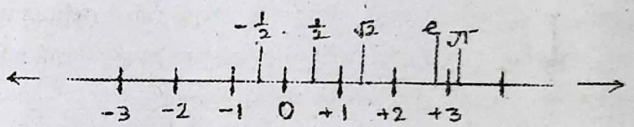

সংখ্যা রেখায় শূণ্যের অবস্থা

শূন্য আবিষ্কার কবে হল? কোন দেশের মানুষ করলেন? ঠিক মতো জানা যায় না। শূন্য আবিষ্কারের কাহিনি আজও রহস্যাবৃত। হয়তো বা চিরকালই থাকবে। কে বা কারা ঠিক কবে শূন্য আবিষ্কার করেছিলেন। সে সম্বন্ধে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়নি। তবে বলা যায়, উন্নততর সংখ্যা পদ্ধতির প্রয়োজন যখন তীব্রভাবে অনুভূত হয়, তখনই শূন্যের আবির্ভাব ঘটে। দশমিক সংখ্যা ও স্থানীয় মানের গুরুত্ব যতদিন পর্যন্ত উপলব্ধি করা যায়নি, ততদিন যেন শূন্য পর্দার আড়ালে অপেক্ষা করছিল। সকলের দৃষ্টির অন্তরালে ছিল। তবে শূন্যকে আবিষ্কার করার কৃতিত্ব অবশ্যই ভারতীয়দের। ভারতীয় গণিতজ্ঞ ব্রহ্মগুপ্ত (খৃষ্টাব্দ ৫৯৭-৬৬৮) তাঁর ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত (Brahmasputhasiddhanta) গ্রন্থে ৬২৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম শূন্য ব্যবহারের কিছু নিয়ম লিপিবদ্ধ করেন, যদিও কয়েকটি নিয়ম পরবর্তীকালে সংশোধিত হয়েছে। শূন্য সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন,

o=a-a, a=o=a, o=a = =a, axo=oxa=o, o+o=o, 0/0=0

শেষোক্তটি পরবর্তীকালে ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

৬৫৫ খৃষ্টাব্দ নাগাদ ভারতীয় গণিতে সংখ্যা হিসাবে শূন্যের ব্যবহার চালু হয়। স্থানীয় মান পদ্ধতি চালু হবার পর কোনো শূন্য স্থান বোঝাতে 0-এর ব্যবহার চালু হয়। ব্রহ্মগুপ্তের আগে স্থানীয় মান অঙ্কপাতনে ডট (.) ব্যবহার হোতো। যেমন ১০০ বোঝাতে ১ এরপর দুটো ডট। গণিতজ্ঞ আর্যভট (Aryabhata) স্থানীয় মান পদ্ধতিতে শূন্য স্থান বোঝাতে ডট ব্যবহার করতেন। ভারতীয় গণিতজ্ঞ মহাবীর (Mahavira) ৮৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁর গ্রন্থ গণিত সার

এরপর 6| পাতায়

সিক বিল্ডিং সিনড্রোম

1 পাতার পর

Chemicals Semsitivities) এবং মাইকোটক্সিকোসিস (Mycotoxicosis)। সারা বিশ্বেই গত শতকে যখন শহর বাড়ছিল, চারদিকে যত্রতত্র গজিয়ে উঠছিল ফ্ল্যাট - দশ বাই দশ ফুটের দুই-কামরা বা তিন কামরার ফ্ল্যাটবাড়িতে আমরা যখন সীমাবদ্ধ জীবনযাপন পর্ব শুরু করলাম, গ্রামের খোলামেলা বাড়ি থেকে এই 'কৌটো'গুলোতেই যখন অভ্যস্ত হয়ে পড়তে থাকলাম - তখনই দেখা দিল নানা সমস্যা। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন এই ধরণের ঘরে বসবাসকারী লোকজনদের মধ্যে টিউবারকিউলোসিস সংক্রমণের ঘটনা হার অনেক বেশি।

জাপানের চার-পাঁচটি বিখ্যাত দেশিয় গবেষণা সংস্থার যৌথ উদ্যোগে যে গবেষণা চালান হয়, তাতে উঠে এসেছে ভয়ংকর তথ্য। এতে দেখা গেছে অতিরিক্ত ইনডোর পলিউশনের কারণে সিক বিল্ডিং সিনড্রোম হয়। জাপানের স্বাস্থ্য ও শ্রম মন্ত্রকের কড়া আইনকানুন থাকা সত্ত্বেও এবং তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মেনে চলা সত্ত্বেও আজও ঘরে ঘরে সিক বিল্ডিং সিনড্রোম-এর প্রকোপ বাড়ছে বই, কমছে না। 'মাল্টি কেমিক্যালস সেনসিটিভিটিস' জাতীয় শারীরিক সমস্যা একটা গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যসমস্যা হয়ে উঠছে, যার কারণের পেছনে রয়েছে ঘরের বাতাসে বিভিন্ন দূষিত যৌগের ও রাসায়নিকের উপস্থিতি। বিজ্ঞানীরা চিন্তিত কারণ খুব কম পরিমাণেও যদি ঘরের বাতাসে এই ধরণের দূষক রাসায়নিকগুলো থাকে, তবে তাই যথেষ্ট 'মল্টি কেমিক্যালস সেনসিটিভিটিস' তৈরির পক্ষে। তাই, আজকাল সিক সিনড্রোম আর মাল্টি কেমিক্যালস সেনসিটিভিটিস সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমেরিকা, ইউরোপ, জাপানসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই ইনডোর কেমিক্যালস পলিউশন নিয়ন্ত্রণে তৈরি হয়েছে একগুচ্ছ আইন-কানুন। এই আইন মোতাবেক যেসব বিল্ডিং মেটিরিয়ালস থেকে বেশি পরিমাণে ফর্ম্যালডিহাইড নিঃসৃত হয় তাদের বাড়ি বা ফ্ল্যাট তৈরিতে ব্যবহার করা যাবে না। যদিও আমাদের দেশে এমন আইন নেই।

সিক বিল্ডিং সিনড্রোমের কারণ ঃ

সিক বিল্ডিং সিনড্রোমের পেছনে নানা কারণ রয়েছে, রয়েছে নানা দূষকের ক্রিয়া-বিক্রিয়া। এই দূষকগুলোর প্রত্যেকটি নিয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে বলা হল ঠিক কোন কোন ফ্যাক্টর এই রোগগুলো ডেকে আনে।

১) অতিরিক্ত আদ্রতা ঃ— স্যাঁতসেঁতে ভিজে ভাব আর বেশি আদ্রর্তার কারণে ঘরের মধ্যে মোল্ড বেশি করে জন্মায়। এগুলো অ্যালার্জি ও রেসপিরেটরি সিস্টেমের নানা রোগ তৈরি করে। এছাড়াও বেশি আদ্রর্তার জন্য আমাদের নাকের ভেতর শুকিয়ে যেতে পারে, শুকনো ত্বকে দেখা দিতে চুলকানি, র‍্যাশ জাতীয় সমস্যা।

২) ঘরের তাপমাত্রা ঃ— ঘরের তাপমাত্রা যদি বেশি হয়, তবে তা আমাদের শরীরের পক্ষে ভালো নয়। ছোট ঘরে ঠিকমতো বাতাস চলাচল না করতে পারলে ঘরের তাপমাত্রা বাড়ে।

৩) পার্টিকুলেট ম্যাটার ঃ— এইগুলো তৈরি হয় ঘরেরই নানা আসবাব থেকে বা বাইরের বাতাস থেকে ঘরে ঢুকে পড়ে। রেসপিরেটারি ট্র্যাক্টের নানা রোগ ডেকে আনে।

৪) নানা গ্যাস ঃ— গ্যাস স্টোভ, ফায়ার প্লেস বা কেরোসিন তেলের দহনে নানা ধরণের গ্যাস, যেমন - তৈরি হয়, যা পরবর্তীকালে ডেকে আনে অ্যাজমা বা হাঁপানির মতো কষ্টদায়ক রোগ।

৫) জীবজ দূষক ঃ— মোল্ড জাতীয় দূষক যারা মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব মারাত্মক।

৬) রাসায়নিক ফ্যাক্টর ঃ— এরা দুই ধরণের - উদ্বায়ী জৈব যৌগ (যেমন- ফর্ম্যালডিহাইড) ও অর্ধ উদ্বায়ী জৈব যৌগ (যেমন - পেস্টিসাইড, থালেট এস্টার প্রভৃতি)। এদের উপস্থিতিতে শ্বসন তন্ত্র ও স্নায়ুতন্ত্র উভয়ের স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হয় ও নানা রোগ দেখা দেয়।

ক্ষতি কতটা? সিক বিল্ডিং সিনড্রোম এর উপসর্গগুলো পরবর্তীকালে ডেকে আনে স্থায়ী কিছু রোগ। সিক বিল্ডিং সিনড্রোম বা সিক হাউজ সিনড্রোমে যে সব উপসর্গ দেখা দেয়, তার তালিকা নেহাত ছোট নয়, এখানে কয়েকটির উল্লেখ করা হল -

১) চোখের নানা সমস্যা, যেমন - শুকনো হয়ে যাওয়া, ক্লান্ত চোখ, চোখের মধ্যে চুলকানি ইত্যাদি, ২) একটুতেই ক্লান্তি বোধ করা, ঘুমঘুম ভাব, ৩) মাথাব্যাথা, ৪) টেনশন, ৫) নার্ভাসনেস, ৬) ঘাড়ে, পিঠে ব্যথা, শক্ত হয়ে যাওয়া, ৭) নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া বা নাক দিয়ে জল পড়া, ৮) সাইনাস, ৯) ঠোঁট শুকিয়ে যাওয়া, ১০) হাঁচি, ১১) ভুলে যাওয়ার সমস্যা, কোন কিছুতে মনোযোগ দিতে সমস্যা, ১২) কাশি, ১৩) শুকনো ত্বক, চুলকান, ১৪) মনখারাপ লাগা, ডিপ্রেশন, ১৫) মাথাঘোরা, ১৬) বুকে কষ্ট, দম বন্ধ হয়ে আসা, ১৭) বমি-বমি ভাব, পেট খারাপ, ১৮) শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই উপসর্গগুলোর প্রত্যেকটিই মানুষের বসবাসের সঙ্গে সম্পর্কিত অর্থাৎ ইনডোর পলিউশন যেখানে বেশি সেই ধরণের বাড়িতে বা ঘরে দেখা দেয়। রোগী বাড়ি বা ঘর থেকে দূরে থাকলে চলে যায়, আবার ঘরে ফেরার পর তা দেখা দেয়।

বিপদ কাদের বেশি?

সিক বিল্ডিং সিনড্রোম শিকার হতে পারেন সবাই। স্বভাবতই যারা বেশিক্ষণ এই ধরণের বাড়িতে কাটান, তাদেরই বেশি হবে। বিশেষ করে বাচ্চা, মহিলা আর বৃদ্ধদের। স্কুল থেকেও বাচ্চাদের সিক বিল্ডিং সিনড্রোম হতে পারে। বিশেষ করে ফর্ম্যালডিহাইড ও টলুইন এর কারণে। গরমের সময় ফর্ম্যালডিহাইডের নিঃসরণের মাত্রা বাড়ে। টলুইন থাকে রঙে - রঙকে পাতলা করতে (মিথাইল বেনজিন) এটি ব্যবহৃত হয়। এই কারণেই বিজ্ঞানীরা বলছেন স্কুলের ভেতর এই ধরণের বিপদ এড়াতে স্কুল বাড়ির রঙ, রেনোভেশন সব কিছুই গরমের ছুটিতে করা উচিত। গরমের এই সময়টাতে বেশির ভাগ ফর্ম্যালডিহাইড বা অন্যান্য উদ্বায়ী জৈব যৌগগুলো দ্রুত বাষ্পীভূত হয়ে যেতে পারে, ফলে লম্বা গরমের ছুটির পর বাচ্চারা যখন স্কুলে আসে, তখন এইসব রাসায়নিক প্রভাব অনেকটাই প্রশমিত হয়ে যায়। একই ভাবে, ফ্ল্যাট বা বাড়ি ঘর রঙ করার বা রেনোভেশন করার অন্ততঃপক্ষে দুইমাস বাদে সেই ঘর বসবাসের উপযুক্ত হয় আর আপনি কিছুটা এড়াতে পারেন সিক বিল্ডিং সিনড্রোম।

লেখক ঃ— ড. সোমা বসু, মোঃ- ৯৪৩৩৯৪১৭৭৬

স্বাধীনোত্তর ভারতে আবিষ্কৃত তিনটি পাখি

'বিপুলা এ ধরণীর কতটুকু জানি!' সত্যিই তাই, জানি না বলেই মানুষের অজানাকে জানার, অদেখাকে দেখার, অচেনাকে চেনার কৌতুহল চিরন্তন। আর তাই নিত্য নতুন আবিষ্কারের নেশায় মানুষ মাতোয়ারা। আমরা আমাদের চারদিকে যত উদ্ভিদ ও প্রাণী দেখি তার চেয়ে বহুগুণ বেশি উদ্ভিদ, প্রাণী ও জীবাণু আছে যা চোখে দেখা যায় না। আবার এ পর্যন্ত মানুষ তার প্রবল অনুসন্ধিৎসায় যত জীব আবিষ্কার করেছে, বাকি রয়ে গেছে তার চেয়ে ২৫/২৬ গুণ বেশি। আমরা এ পর্যন্ত পরিচয় জানতে পেরেছি মাত্র ১৭-১৮ লক্ষ প্রজাতির উদ্ভিদ, প্রাণী ও জীবানুকে।

জীব জগতের যে দুটি সদস্য নিয়ে আদ্যিকাল থেকে মানুষের আদিখ্যেতা অনেকটা বেশি তারা হল ফুল ও পাখি। এ দুয়ের মধ্যে কে প্রথম আর কে দ্বিতীয় তা নিয়ে বিশ্লেষকরা বিশ্লেষণ করুন, পাখি-ফুল বা সাধারণ মানুষের তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। শিল্পে, সাহিত্যে, নান্দনিকতায় ফুল ও পাখি সবচেয়ে আদরণীয়। তবে আজ ফুলের কথা থাক, পাখি নিয়ে কিছু বলি।

গোটা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে থাকা পাখিরা স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে-আকারে শুধু

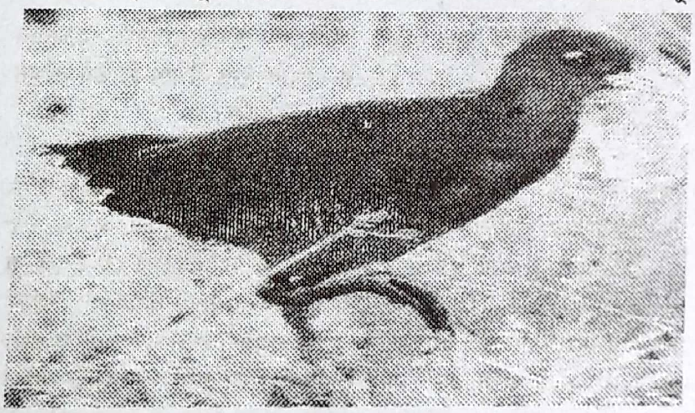

গ্রেট নিকোবর ক্রেক (Great Nicobar Crake)

বৈচিত্রময় নয়, কৌতুহলোদ্দীপকও। এযাবৎ পৃথিবীতে প্রায় ৯,৭০০ প্রজাতির পাখিকে পক্ষি বিজ্ঞানীরা চিহ্নিত করতে পেরেছেন। কিন্তু এর বাইরে কত যে অজানা পাখি লোক চক্ষুর অন্তরালে প্রকৃতির কোলে বিরাজ করছে তা জানা নেই। ভারত জীব বৈচিত্র্যের নিরিখে বিশ্বে অত্যন্ত সম্পদশালী দেশ। ভারতে পাখির প্রজাতি যা এ পর্যন্ত চিহ্নিত হয়েছে তা হল ১,২৩২। অর্থাৎ পৃথিবীর মোট আবিষ্কৃত পাখি প্রজাতির এক অষ্টমাংশের অধিষ্ঠান হল ভারতভূমি। নদী-নালা-জঙ্গল-পাহাড়-পরিবৃত ভারতে আরও বহু পাখির প্রজাতি আজও অনাবিষ্কৃত থাকার সম্ভাবনা। তবে স্বাধীনোত্তর ভারতে আবিষ্কৃত পাখির প্রজাতির সংখ্যা হল তিন। আজ সেই তিন প্রজাতির পাখির কথাই বলব।

মরচে - কণ্ঠী গায়ক ছাতারে (Rusty Throated Wren Babbler)

মার্কিন পক্ষিবিদ সিডনি ডিলন রিপলে তাঁর সঙ্গী পক্ষিবিদদের নিয়ে পূর্ব অরুনাচল প্রদেশের মিশমি পাহাড়ে অবস্থিত দ্রেয়ি নামের একটি এলাকায় প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের সময় এক্কেবারে নতুন ধরণের একটা পূর্ণবয়স্ক পাখি দেখতে পান। দিনটা ছিল ১৯৪৭ সালের ৫ জানুয়ারি। ভারত তখন স্বাধীন হবো হবো করছে। লম্বায় পাখিটা প্রায় ৯ সেমি, অর্থাৎ বেশ ছোটো, লেজটা গায়ক-ছাতারেদের মতো। গলার রঙ মরচে-বাদামি। চিবুক সাদা, তার উপর গাঢ় ডোরা দাগ। পেটের দিকের রঙ বাদামী, চিবুক সাদা, তার উপর গাঢ় ডোরা দাগ। পেটের দিকের রঙ বাদামী। ঠোঁটের রঙ কালো।

আবিষ্কার স্বাধীনতার আগে হলেও খবর প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে। আবিষ্কারের রিপোর্ট পেশ করেন ভারতের প্রবাদ প্রতিম পক্ষিবিদ ড. সেলিম আলি এবং রিপলে। তাঁরা টাইপ নমুনা হিসেবে একটি মৃত স্ত্রী পাখি প্রায় ১৬০০ মিটার উঁচু পাহাড়ি এলাকা থেকে সংগ্রহ করেন। বিজ্ঞান সম্মত নামকরণ করা হয় *Spelaeornis badelgularis*।

এরপর দীর্ঘদিন আর প্রজাতিটির কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। মিশমি পাহাড়ে তো নয়ই, আশপাশের পাহাড়েও মেলেনি। সবাই যখন ভেবে নিতে বসছে, ওরা বিলুপ্ত, তখনই গত ২০০৪ সালের ১৮ নভেম্বর মিশামি পাহাড়ে প্রায় ১৮০০ মিটার উঁচুতে মায়োদিয়া গিরিপথের মার্কিন পক্ষিবিদ বেন কিং এবং জুলিয়ান পি. ডোনাহিউ মরচে-কণ্ঠী গায়ক ছাতারেকে পুনরাবিষ্কার করেন।

প্রজাতিটি কেবল নিশামি পাহাড় সংলগ্ন অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। আর প্রজাতিটি

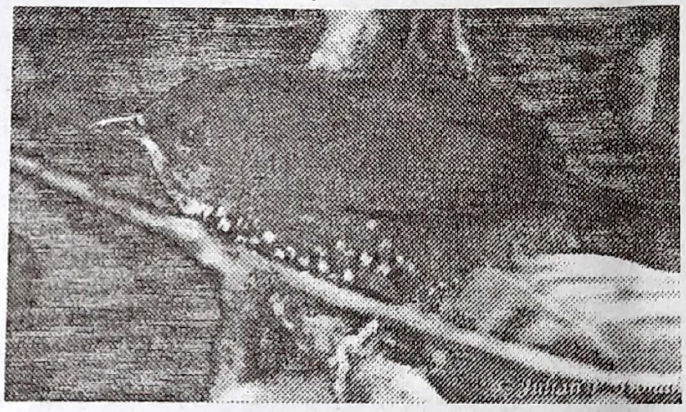

মরচে - কণ্ঠী গায়ক ছাতারে (Rusty Throated Wren Babbler)

যে বিপন্ন তাতে সন্দেহ নেই। সরকারিভাবে সংরক্ষণেরও কোনও উদ্যোগ নেই। বিপন্নতার প্রধান কারণ বনভূমি ধ্বংস। পক্ষিবিদদের ধারণা সব মিলিয়ে এখন ২৫০০-১০,০০০ মরচে-কণ্ঠী গায়ক ছাতারে টিকে আছে।

বুগুন লিওসিচলা (Bugun liocichla)

পেশাদার ভারতীয় জ্যোতিপদার্থবিদ তথা সখের পক্ষিবিদ রমন আত্রেয়া পশ্চিম অরুনাচলপ্রদেশে এগলেনেস্ট অভয়ারণ্যে Eaglenest Willife Sanctuary ১৯৯৫ সালে প্রথম এক জোড়া বুগুন লিওসিচলা দেখেন। তাঁর ধারণা হয়, পাখি দুটি এশিয়ান ছাতেরে *Asian babbler*-র সমগোত্রীয় হলেও ভিন্ন প্রজাতির পাখি। তবে যেহেতু আত্রেয়ার কাছে কোনও টাইপ নমুনা ছিল না তাই নতুন প্রজাতি হিসেবে দাবি জানানোর সপক্ষে কোনও প্রমাণও ছিল না।

দশ বছর পর আত্রেয়ার আঁকা পাখিটির ছবি দেখে তাঁর এক সহকর্মী বলেন য়ে পাখিটি এমেই শান লিওসিচলা (*Emei Shan Liocichla*), যার বিজ্ঞানসম্মত নাম (*Liocichla Omeiensis*)। কিন্তু তাঁর প্রস্তাব ধোপে টিকল

এরপর 6 পাতায়

তিনটি পাখি

5 পাতার পর

না, কারণ এমেইশান লিওসিচলা হল দক্ষিণ পশ্চিম চিনের পাখি. এগলেনেস্ট অভয়ারণ্য থেকে চিনের ওই স্থানের দূরত্ব ১০০০ কিমির বেশি। স্থায়ী পাখিদের ক্ষেত্রে এমনটা কী করে সম্ভব!

যাই হোক, বিতর্ক এড়াতে আত্রেয়া বনবিভাগের অনুমতি নিয়ে ২০০৬ সালের মে মাসে জাল দিয়ে একটা স্ত্রী (অনুমান) বুগুন লিওসিচলা ধরেন। তিনি পাখিটির ছবি তোলেন ও বহিরাকৃতিগত যাবতীয় পর্যবেক্ষণ নিখুঁত ভাবে লিপিবদ্ধ করেন। তারপর জালের আঘাতে খসে যাওয়া কয়েকটি পালক রেখে দিয়ে তিনি পাখিটিকে ছেড়ে দেন। সমস্ত বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করে তিনি নিশ্চিত হন যে এমেই শান লিওসিচলা হতেই পারে না, তবে অবশ্যই নিকটাত্মীয়। বুগুন লিওসিচলার পালক, গান ও আকৃতি সবই আলাদা। এমেই শানের চেয়ে বুগুন অন্তত দশ শতাংশ বড়ো। তবে ঠোঁটের আকার এমেই শানের চেয়ে ছোট।

বুগুন লিওসিচলা দৈর্ঘ্যে হয় প্রায় ২২ সেমি, পালকের রঙ সবুজাভ ও ধূসর, ডানায় হলুদ, লাল কালো ও সাদা ছোপ, লেজ কালো, নিচের দিক ও আগায় টুকটুকে লাল। পা গোলাপি রঙের, আর চঞ্চুর রঙ কালো। মুখ ফ্যাকাসে সাদা। মাথা কালো ও চোখের চারপাশে হলুদ। এদের ডাক খুব স্পষ্ট, বাঁশির মতো, অনেকটা দূর থেকে শোনা যায়।

আত্রেয়া মোট ১৪টি বুগুন লিওসিচলা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। একটা বাদে বাকি সব পর্যবেক্ষণই ছিল ২০০০ মিটারের বেশি উঁচুতে ঘন ঝোপঝাড়ের ভেতরে। বুগুনের ছোট ছোট ঝাঁক জানুয়ারি মাসে দেখা যায়। প্রজননকাল সম্ভবত মে মাস, কারণ ওই সময় জোড়ায় জোড়ায় ঘুরতে দেখা যায়।

কোনও টাইপ নমুনা সংরক্ষিত না থাকা সত্ত্বেও (ICZN) বুগুন লিওসিচলাকে নতুন প্রজাতির স্বীকৃতি দিয়েছে। আসলে এদের সংখ্যা খুব কম হওয়ায় জীবন্ত পাখি ধরে তাকে হত্যা করার অনুমতি নেই। আবার, এখনও পর্যন্ত কোনও মৃত নমুনাও সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এদের বিজ্ঞান সম্মত নাম দেওয়া হয়েছে, (*Liocichla bugunorum*) 'বুগুন' কথাটি নেওয়া হয়েছে বুগুন জনজাতি থেকে। পাখিটি যে এলাকায় দেখা যায় সেখানে ওই জনজাতির বাস। আত্রেয়ার ধারণা, ভূটান ও অরুনাচল প্রদেশের পার্শ্ববর্তী এলাকাতেও বুগুন লিওসিচলা থাকার সম্ভাবনা আছে।

গ্রেট নিকোবর ক্রেক (Great Nicobar Crake)

২০১১ সালের নভেম্বর মাসে জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া এর একটি দল ইউনেস্কো-র 'ম্যান অ্যান্ড বায়োস্কিয়ার প্রোগ্রাম' এ গ্রেট নিকোবর বায়োস্কিয়ার রিজার্ভে অবস্থিত বিভিন্ন প্রজাতির তালিকা তৈরির কাজ করছিল। দিনটা ছিল ২১ নভেম্বর। ক্যাম্পবেল উপসাগরের পূর্ব উপকূল থেকে ৬ কিমি দূরে গোবিন্দনগর সুনামি আশ্রয় কেন্দ্রে কাজ করছিলেন দুই বিজ্ঞানী এস. রাজেশ কুমার এবং সি. রঘুনাথন। তাঁরা দেখেন, সম্পূর্ণ নতুন ধরণের একটি পাখি আপন মনে পোকা খুঁজে চলেছে। তাঁরা লক্ষ্য করলেন, প্রায় চার মিটার এলাকার মধ্যে যে প্রায় ১৫ মিনিট ধরে খাবার খুঁজছে। এরপর রাজেশ কুমার পাখিটার কয়েকটা ছবি তুললেন। শাটারের শব্দ তার কানে পৌঁছল কিনা জানিনা, পাখিটা কিন্তু বিরক্ত হল না। এবার বিজ্ঞানী রাজেশ কুমার ক্যামেরা তাক করে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে আরও কাছ থেকে ছবি তোলার চেষ্টা করতেই, পাখিটা টের পেল বিপদের গন্ধ। কোনও শব্দ না করে এবং

এরপর 7 পাতায়

শূন্য কাহিনী

3 পাতার পর

সংগ্রহ (Ganita Sara Samgraha)-এ শূন্যের গুণনের নিয়মগুলি বিবৃত করেন। ব্রহ্মগুপ্তের প্রায় ৫০০ বৎসর পর ভারতীয় গণিতজ্ঞ ভাস্কর (Bhaskara) শূন্যের কয়েকটি ধর্ম (Property) উল্লেখ করেন। যেমন, $O2=0$, $\sqrt{0}=0$।

শূন্য সম্পর্কে ভারতীয় গণিতজ্ঞদের গবেষণা ও ভাবনা চিন্তার দ্বারা অন্যান্য দেশের গণিতজ্ঞগন উৎসাহিত হন। পরবর্তীকালে ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশের গণিতজ্ঞদের একাংশ শূন্য নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেন এবং শূন্যের বিভিন্ন ধর্ম উল্লেখ করেন। এঁদের মধ্যে আল-খাওয়ারিজমি (Al-Khwarizmi) , ইবন এজরা (Ibn Ezra), চীন চিউ-শাও (Chin Chiu-shao), লিওনার্দো ফিবোনাচি (Leonardo Fibonacci) উল্লেখযোগ্য।

সংখ্যা (number) হিসাবে শূন্য এবং স্থানীয় মান অঙ্কপাতন পদ্ধতিতে অঙ্ক (digit) হিসাবে শূন্য এক জিনিস নয়। হিন্দুদের স্থানীয় মান অঙ্কপাতন পদ্ধতিতে দশমিক বলা হয়, কারণ এই পদ্ধতিতে স্থানীয় মানগুলি ডান দিক থেকে বাম দিকে পরপর দশ গুণ করে বেড়ে যায়। যেমন ২২ সংখ্যাটিতে একক স্থানীয় অঙ্ক ২-এর যে মূল্য দশক স্থানীয় অঙ্ক ২-এর মূল্য তার দশ গুণ বেশি। দশকে একক ধরে গননা এবং সংখ্যা গঠনের পদ্ধতি বৈদিক ভারতেই প্রচলিত ছিল। এছাড়া ব্যাবিলন, প্রাচীন মিশর প্রভৃতি দেশেও এর অল্প বিস্তর প্রচলন ছিল।

শূন্য আবিষ্কারের ফলে সংখ্যা পদ্ধতিতে এক নতুন মাত্রার সংযোজন হয়। যেমন ২ ও ৫ এর মধ্যে বিভিন্ন সংখ্যক শূন্য বসিয়ে বিভিন্ন সংখ্যা পাওয়া যায়। ২৫, ২০৫, ২০০৫, ২০০০৫ ইত্যাদি।

$১০^{২}$ বললে বোঝায় ১ এর পর দুটি শূন্য। এভাবে $১০^{৩}$ = হাজার, $১০^{৬}$ = মিলিয়ন (প্রযুত), $১০^{৯}$ = বিলিয়ন (সমুদ্র), $১০^{১২}$ = ট্রিলিয়ন (পরার্ধ), $১০^{৬০}$ = ডিজিনটিলিয়ন ইত্যাদি। (বন্ধনীতে শব্দগুলি যজুর্বেদে আছে)

শূন্য মাহাত্ম্য এখানেই শেষ নয়। শূন্য যখন বিচ্ছিন্নভাবে একক বা দলবদ্ধভাবে থাকে তখন তার নিজস্ব শক্তি (Power) থাকে না। কোনো সংখ্যার বাম দিকে এক বা একাধিক শূন্য বসালে তখনও সংখ্যাটির শক্তি থাকে না। কিন্তু সংখ্যাটির ডানদিকে একটি শূন্য বসালে সংখ্যাটির শক্তি চলে আসে, এভাবে পর পর শূন্য বসাতে থাকলে প্রাপ্ত সংখ্যাগুলি পূর্ববর্তী সংখ্যার দশ গুণ হয়।

শূন্য সংখ্যাটিকে ব্যবহার করে কতকগুলি মূল প্রাথমিক (elementary) নিয়ম পাওয়া যায়। ধরা যাক, x একটি বাস্তব অথবা কাল্পনিক সংখ্যা (imaginary number)। তাহলে

১) $x+0= 0+x =x$

২) $x-0 =x$ এবং $0-x = -x$

৩) $x.0 = 0.x = 0$

৪) $x^{0}=x/x=1$ যখন $x\neq0$ এবং $0^{x}=0$ (x ধনাত্মক বাস্তব সংখ্যা হল)

৫) $0/x=0$ যখন $x\neq0$ কিন্তু $x/0$ অসংজ্ঞাত (underfined)

৬) $0/0$ অনির্ণেয় (indeterminate)

৭) $L0= ১$ শূন্যের এমন মাহাত্ম্য ছড়িয়ে আছে গনিত বিজ্ঞানের সকল শাখায়। শূন্যের গঠন সহজ, কিন্তু শক্তি অপরিসীম। ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, - সংখ্যার এই দশটি প্রতীক ব্যবহার করেই যে কেনো সংখ্যা গঠন করা সম্ভব। শূন্য সংখ্যাটির ব্যবহারগত বৈচিত্র্য আমাদেরকে বিস্মিত করে। এই শূন্যের আবিষ্কার আমাদের দেশে। এই আবিষ্কারের সাথে যুক্ত গণিতাবিদ্‌দের জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা।

লেখকঃ গোবিন্দ দাস, মোঃ- ৮৪২০০৪০৮৫২

সাবধান

অ্যামোনিয়া ফ্রি!

টিভি সংবাদপত্র সাময়িক পত্র সর্বত্রই দেখা যায়। চুল কালো করার জন্য রঙ করার জন্য পন্যটি অ্যামোনিয়া ফ্রি। বস্তুত তা একেবারেই নয়।

প্রকৃতির নিয়মে জরা আসে। শিল্প বিপ্লবের আগে পর্যন্ত মানুষ তাই জেনে এসেছে। বিজ্ঞানের আবিষ্কারের বিস্ময় নিয়ে শিল্প যত প্রগতি পেয়েছে ততই মানুষ কৃত্রিমতা শিখেছে। আবিষ্কার উদ্যোগ ও ব্যবসার চাপে জীবনযাত্রা ও খাদ্যাভ্যাস পালটেছে ফলে বিরূপ প্রতিবর্তী ক্রিয়ায় ষাট বা পঞ্চাশ থেকে চুল পাকার বয়সও কমে গিয়ে চল্লিশ বা তার আগে এসে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে মানুষের দর্শণ ভোগের বাসনা আত্মসর্বস্বতা রুচি অন্যরকম হয়েছে। নিজেকে সুদর্শণ বানাবার প্রবণতা প্রশ্রয় পেয়েছে কৃত্রিম প্রসাধন সামগ্রী সুলভ হওয়ার ফলে। বয়সের জরাকে মুছে ফেলার সুলভতম উপায় সাদা হতে থাকা চুলকে কালো করার প্রবৃত্তি যুগিয়েছে। কিন্তু কৃত্রিম প্রসাধনীর সীমাবদ্ধতা আছে— পেট্রোরসায়ন শিল্প এদিকে হাজার হাজার রাসায়নিক উপহার দিয়েছে নানা সুদৃশ্য নামের মোড়কে এবং পার্সোন্যাল কেয়ার প্রোডাকটসের ৯৫ শতাংশই হল কৃত্রিম বা সিনথেটিক এবং এখানেই উৎপাতের শুরু ও দুর্ভোগের শেষ।

এবার দেখি অ্যামোনিয়া কি করে ফ্রি হয়!

অ্যামোনিয়া বর্ণহীন ক্ষারীয় (অ্যালক্যালাইন) গ্যাস। সুগন্ধির এবং রেফ্রিজারেশনের এক উপাদান। চুলের রঙ কালো করার উপাদানের মধ্যেও উপস্থিত থেকে পিএইচ এর স্থিতিস্থাপকতা (স্টেবিলিটি) বাড়ায়। কসমেটিকের উপাদানের মধ্যে থেকেও একই কাজ করে এবং প্লাস্টিক, একসপ্লোসিভস, পেস্টিসাইডস তৈরিতে আবশ্যিক। প্রোটিন সংশ্লেষেও প্রয়োজন।

অ্যামোনিয়া বিষন (টক্সিসিটি) তৈরি করে। উপরি পাওনা স্নায়ু, পাকনাড়ি, লিভার, প্রজনন ও শ্বাস যন্ত্র, ত্বক, ইন্দ্রিয় এতগুলি ব্যবস্থাকে সে বিষনদুষ্ট করে। হাঁপানির কষ্টকে বাড়িয়ে দেয়। তরল উপাদান ত্বকে প্রচন্ড জ্বালা দহন তৈরি করে। বাষ্পীয় উপাদান অল্পমাত্রার হলেও চক্ষু ত্বক শ্বাসনালীকে বিব্রত করতে পারে। উচ্চমাত্রার বাষ্প হলে কনজাংকটিভাইটিস, ল্যারিংজাইটিস যেমন তৈরি করে তেমনই ফুসফুসে জলীয় পদার্থ জমতে ও ফুসফুসের কোষের ফোলা ভাব বাড়িয়ে দেওয়ার কারণ হয়; প্ল্যুরিসি এসফাইসিস হলে এমন হয়, লক্ষণ বলতে শ্বাসকষ্ট ও কাশি উপহার। অ্যামোনিয়া খেলে—মলের মধ্যে রক্ত, শ্বাসনালী ও পাকাশয়ে দহন, তলপেটে (লোয়ার অ্যাবডোমেন) অত্যন্ত যন্ত্রণা এবং বমি শুরু হবে। শিল্প কারখানা পরিশেষে উগরে দেয় অ্যামোনিয়া—এমন গ্যাস লিক থেকে মৃত্যুর ঘটনাও অনেক আছে। পরিবেশে অ্যামোনিয়া মিশে তৈরি হয় অ্যামোনিয়া সালফেট এবং অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট যা উচ্চহারে মাছের পক্ষে দুরন্ত বিষন, এবং টেরর ব্লাস্টে সব সময় এটা ব্যবহার হয় - অধুনা বোধগয়াতেও বিশেষ উচ্চমাত্রায় অ্যামোনিয়া মাছের শ্বাসক্রিয়ার হার বৃদ্ধি করে হৃৎপিন্ডের ধড়ফড়ানি ও অক্সিজেন চাহিদা বাড়িয়ে দেয় এবং তড়কা-খিঁচুনি- কোমা এনে দেয়, এমনকি মৃত্যুও। এমনকি কম মাত্রার দূষণেও তা নানা পরিবর্তন এনে দেয়। যেমন ডিম থেকে বাচ্চা তৈরির হার কমে যায়; গিল-লিভার-কিডনীর কোষের ক্ষতি করে।

অ্যানহাইড্রাস অ্যামোনিয়া চোখের জলের ভাগ থেকে শতকরা আশি ভাগ জলীয় পদার্থ টেনে নেয়। চোখের কোষের ক্ষতি করে অতি দ্রুত। অষ্ট্রেলিয়ার কসমেটিক কেমিস্টদের গবেষণায় দেখা গেছে—অ্যামোনিয়া যে সব কসমেটিকসে 'সারফ্যাকিট্যান্টস' ও 'ইমালসিফায়ার' হিসাবে থাকে তারা 'নাইট্রোসঅ্যামাইনের' যোগান দেয়, যা খাদ্যের বা পরিবেশের উপাদানে যুক্ত হয়ে গিয়ে মানুষের ক্যানসার রোগে ভূমিকা নেয়। সে দেশে এর ব্যবহার নিষিদ্ধ।

ভোগবাসনা ও পণ্যমুখীনতা মানুষকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। হেয়ার ডাই পণ্যে যদি অ্যামোনিয়া না থাকে তো বারবার তা অ্যামোনিয়া ফ্রি বলে পণ্যগ্রাহককে জানানোর চেষ্টাই বা কেন। উপাদানে তো অ্যামোনিয়া আছেই। ঐ যে বললাম হেয়ার ডাই না করলেই হয়, মনকে শাসনে অনুশাসনে বাঁধতে হবে। এখন বুঝে নিতে হবে কসমেটিকসের আরো নানা সামগ্রিতে. চুলের কলপের রঙে অ্যামোনিয়া সত্যিই ফ্রি কি না। চেতনার রঙে পান্না যদি সবুজ না হয় তবে দেখে নিতে হবে চুলের কলপে, হেয়ার ডাইয়ে যেন অ্যামোনিয়া না থাকে।

লেখক ঃ রণজিৎ পাল, ৪বি উজ্জ্বলা অ্যপার্টমেন্ট, ১বি চন্ডী ঘোষ রোড, কলকাতা-৪০, মোঃ-৯৮৩১২০৬৫৪৬

তিনটি পাখি

5 পাতার পর

না উড়ে গিয়ে সে খুব দ্রুত খাড়া পাহাড় বেয়ে দৌড়ে উঠে গেল ও লুকিয়ে পড়ল।

পাখিটিকে প্রথম ২১ নভেম্বর, ২০১১ দেখলেও এই কাহিনি আবিষ্কারক দুই বিজ্ঞানী প্রকাশ করেন ২৭ জুলাই, ২০১২। রাজেশ কুমার ও রঘুনাথনের বর্ণনা অনুসারে, পাখিটির আকার আমাদের চেনা ডাহুকের মতো। মাথার উপর ও পিঠ গাঢ় লালচে বাদামি। চিবুক ও গলার নিচের দিক মরচে লাল। লেজের দিক কালচে বাদামি। জঙঘা ও পেটে কালো রঙের চওড়া ও সাদা রঙের সরু ডোরা দাগ, পায়ের রঙ গাঢ়-কমলা-লাল ও ঠোঁট ফ্যাকাসে সবুজ। ঠোঁটের আগা সামান্য লাল। আর চোখের রঙও লাল।

বিজ্ঞানীদ্বয় নিশ্চিত হল যে পাখিটি র‍্যালিনা (*Rallina*) পরিবারভুক্ত Water Crake এর একটি প্রজাতি। র‍্যালিনা পরিবারে এখনও মোট আটটি প্রজাতি রয়েছে। এগুলো অষ্ট্রেলিয়া ও এশিয়ায় সীমাবদ্ধ। ভারতে রয়েছে তিনটি প্রজাতি, যাদের মধ্যে একটি হল আন্দামান ক্রেক (*Rallina camnigni*)। এটি কেবল আন্দামানেই পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীদ্বয়ের বক্তব্য হল, নতুন আবিষ্কৃত পাখিটির ঠোঁট, পা এবং পেট ও জঙঘার রঙ একেবারেই অনন্য।

খ্যাতনামা মার্কিন পক্ষিবিদ ও মিচিগান স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পি.সি. রামসুসেন পাখিটির বর্ণনা জেনে ও ছবি দেখে এটিকে নতুন প্রজাতি বলে চিহ্নিত করেছেন। নাম দেওয়া হয়েছে গ্রেট নিকোবর ক্রেক। তবে বিজ্ঞানসম্মত নাম এখনও দেওয়া সম্ভব হয়নি, কারণ পাখিটির কোনও টাইপ নমুনা (সাধারণ মৃত পাখি) এখনও সংগ্রহ করা যায়নি। জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার বিজ্ঞানীরা চেষ্টা চালাচ্ছেন গ্রেট নিকোবর ক্রেকদের স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে আরও গভীর ভাবে জানতে এবং টাইপ নমুনা হিসেবে একটি মৃত পাখি সংগ্রহ করতে। মৃত পাখির একটা নমুনা পাওয়া গেলেই ওদের বিজ্ঞানসম্মত নামকরণ করা সম্ভব হবে।

— সৌম্যকান্তি জানা, পূর্ববাজার, কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ৭৪৩৩৪৭, চলভাষ -৯৪৩৪৫৭০১৩০, ই-মেল ঃ janasoumyakanti@gmail.com

অষ্টধাতুর আংটি নাচে!

হাটে-বাজারে প্রায়শই দেখা যায় একটি কাঁসার বাটি বা হাতে কাত করে ধরে তাতে সামনে রাখা তাবিজ বা তথাকথিত অষ্টধাতুর আংটি রেখে একটি ইঞ্চি ছয়েক লম্বা কালো রঙের কাঠের রুলার ডান হাতে রুলারের এক প্রান্ত বাটিকে স্পর্শ না করিয়ে বাটির পরিধি বরাবর চক্রাকারে ঘোরাতে থাকলে তাবিজ বা আংটি নাচতে থাকে। তাবিজ বা আংটির গুণকীর্তন করে একই ধরণের তাবিজ বা আংটি, কথাবার্তা পোশাক পরিচ্ছদ দেখে ক্রেতাদের কাছে এক এক রকম দামে বিক্রি করা হয়। বলা হয় এই আংটি বা তাবিজ সর্বরোগহর। বিক্রেতারা বলেন অষ্টধাতু বা আট রকম ধাতুর মধ্যে পারদেরও সংমিশ্রণ আছে। কথাটা হল পারদ অন্য ধাতুর সাথে মিশ্রিত হয়না। কচুপাতার দু'চার ফোটা জল দিলে, জল যেমন টলমল্ করে, পারদও তেমনি। তাবিজ বা আংটি নাচার কৌশল নিম্নরূপ ঃ

ক) বেশ বড় আকারের বিশেষ ধরণের কাঁসার বাটি, যতটা পাতলা বা হালকা হওয়া সম্ভব তা হতে হবে। বাটির তলদেশে কাঁধা থাকতে হবে অর্থাৎ চায়ের কাপের বাইরের নিচের মত হতে হবে। ঐ কাঁসার বাটির ভেতরে অপেক্ষাকৃত ছোট আর একটি ওজনে যতটা সম্ভব হালকা কাঁসার বাটি বসাতে হবে। দুই কাঁসার বাটির দুই তলদেশের মধ্যে কিছুটা গ্যাপ বা ফাঁকা থাকতে হবে, যা বাইরে থেকে বোঝা যাবে না। দুই বাটির কাঁধা বা প্রান্তদেশ রিভেট করে সংযুক্ত করা থাকবে। আপাত দৃশ্যে একটি বাটিই মনে হবে। এরূপ বাটির তলদেশে মাঝ বরাবর একটি মোটা বেতের বা কাঠের রুলারের (লম্বায় ইঞ্চিছয়েক, গোলাই ইঞ্চি চারেক) একপ্রান্ত পোক্তভাবে সেট করা হতে হবে। অর্থাৎ বাটির সাথে একটি রুলারের সংযুক্তি থাকবে। এবার রুলারের অপর প্রান্ত বা হাতে ধরে ডান হাতের রুলার দিয়ে কাত করা অবস্থায় ডানহাতের রুলার দিয়ে আঘাত করতে হবে (রুলারের একপ্রান্ত বাটির সাথে সংযুক্ত এবং রুলারের অপর প্রান্ত বা হাত দিয়ে ধরা রুলারের মধ্যবর্তী জায়গায়) দর্শক আসার আগে। বাটিতে যে কম্পন তৈরি হবে তা চোখে দৃশ্যমান নয়। এবার একটি তাবিজ বা তাগা বা তথাকথিত কালো ঘোড়ার ক্ষুরের নাল বা রাস্তার ছোট পাথর, বাটিতে রাখতে হবে। কাঁসার বাটিতে উৎপন্ন করা কম্পনের কারণেই তাগা বা তাবিজ বা ঘোড়ার খুড়ের নাল বা পাথর ধীরে ধীরে নাচতে থাকবে। মনে রাখতে হবে কম্পন তৈরি না করলে তাগা বা তাবিজ বা খুড়ের নাল বা পাথর নাচবেনা। আর কতটা কম্পনে কি জিনিস কতটুকু ওজনের জিনিস নাচবে তা আগাম ঠিক করে নেওয়া হয়। যতটা কম্পন তৈরি হবে তার চাইতে ওজন বেশি হলে জিনিসটি কিছু নাচবে না। ঘরে আমাদের বাবা মা-বোনদের হাত থেকে কাঁসার থালা, বাটি বা গ্লাস হাত থেকে মেঝেতে পড়ে গেলে ঝনন্....আওয়াজ হয়। এই ঝনন্.... আওয়াজ বেশ কিছুটা সময় ধরে থাকে। দ্রুততার সাথে হালকাভাবে স্পর্শ করলে কম্পন অনুভূত হয়।

খ) মাঝারি আকারের চাইতে ছোট, ওজনে হালকা দুটি কাঁসার বাটির প্রান্তদেশ রিভেট করে সংযুক্তি ঘটাতে হবে। রিভেট দেখে চট্ করে বোঝা যাবে না একটিই বাটি। এমন ভাবে তৈরি করাতে হবে দুই বাটির তলদেশের ভেতরে কিছুটা ফাঁক থাকবে, আপাতদৃশ্যে যা বোঝা যাবে না। বাটির তলদেশে কাঁধা থাকতে হবে অর্থাৎ চায়ের কাপের বাইরের নিচের মত হতে হবে। দুটি বাটি অথচ দৃশ্যমান বাটি একটিই। বাটিটি বা হাতের পাঁচ আঙ্গুলের ওপর আলতোভাবে যতটা সম্ভব আড়াআড়ি বা প্রায় ৯০ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে বসাতে হবে। তাতে আংটি বা নাল, তাগা বা তাবিজ বা রাস্তার ছোট পাথর রেখে ডানহাতের বৃদ্ধ, তর্জনী ও মধ্যমা দিয়ে মাঝবরাবর ধরা রুলারের (লম্বায় ইঞ্চিছয়েক, গোলাইতে ইঞ্চিচারেক) বা দিকের প্রান্ত বাটিকে স্পর্শ না করিয়ে বাটির চারপাশে সামনের দিকে চক্রাকারে ঘোরাতে হবে। রুলার অর্ধচক্রাকার হয়ে ওপর দিকে ওঠানোর ঘোরানোর সময় ডানহাতের অনামিকা এবং কণিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে বাটিতে ঝাপটা দিতে হবে বাটিতে কম্পন তৈরির জন্য। ঝাপ্টা দেওয়াটা দর্শকের নজর এড়িয়ে যায়। বিষয়টি অভ্যাসের। ব্যাস তাগা বা তাবিজ বা নাল বা রাস্তার ছোট পাথর নাচতে থাকবে কম্পন তৈরি হলে।

গ) খ এর অনুরূপ বাটি বা হাতের বৃদ্ধ তর্জনি ও মধ্যমার ওপর হালকাভাবে বসাতে হবে। বা হাতের অনামিকা এবং কনিষ্ঠ আঙ্গুল আলগা থাকবে যা দর্শকের চোখে দৃশ্যমান নয়। ডান হাতে ধরা রুলার চক্রাকারে ঘোরানোর সময় রুলারের প্রান্ত দিয়ে বা হাতের অনামিকা ও কনিষ্ঠ আঙ্গুলে হালকা ঝাপ্টা দিতে হবে (দর্শকের চোখে দৃশ্যমান নয়)। অল্প হলেও অবশ্যই বাটিতে কম্পন তৈরি হবে, যার কারণে ছোট পাথর, ছোট আংটি, ছোট সরু নাল, ছোট তাগা ছোট তাবিজ নাচবে। বিষয়টি অভ্যাসের। কম্পন তৈরি করার হওয়ার উপরই নির্ভরশীল, কি নাচবে আর কি নাচবে না। মাস তিনেক আগে মাদারীহাট বাজার থেকে পাঁচজনের এক গ্রুপ এবং গত ২৬-০১-২০০৯ তারিখে মাদারীহাট স্কুল চৌপথি থেকে এরূপ একজন লোক ঠকানো বুজরুক, বিজ্ঞানকর্মীদের পাল্লায় পড়ে তল্পিতল্পা গুটিয়ে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়।

লেখক ঃ তপন চন্দ, পোঃ ও গ্রাম - মাদারীহাট, জেলা-জলপাইগুড়ি।
মোঃ-৯৭৩৩১৫৩৬৬১

সংবাদ ঃ কাঁচরাপাড়া শিশু উৎসব ২০১৩ ঃ বিজ্ঞান দরবারের পরিচলনায় ২৭-১২-১৩ মহাকাশ ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক রঙিন আলোকচিত্র প্রদর্শনী সহযোগে বক্তব্য রাখেন ড. অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। ২২-১২ থেকে ১-১-১৪ প্রতিদিন শিশু মেলায় বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও বিজ্ঞান পত্রপত্রিকা সহ স্টলের আয়োজন করে বিজ্ঞান দরবার।

যোগাযোগ—বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর), পোঃ কাঁচরাপাড়া ৭৪৩১৪৫, উঃ ২৪ পঃ। ফোন ঃ ০৩৩-২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩৩০০৯২।
সম্পাদক মন্ডলী—অভিজিৎ অধিকারী, বিবর্তন ভট্টাচার্য, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, তাপস মজুমদার, চন্দন সুরভি দাস, চন্দন রায়, কিঞ্জল বিশ্বাস।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষর বিন্যাস ঃ রিম্পা কম্পিউ, কাঁচরাপাড়া হাইস্কুল মোড়, কাঁচরাপাড়া, চলভাষ ঃ ৯৮৩৬২৭১২৫৩
সম্পাদক—শিবপ্রসাদ সরদার। ফোন ঃ ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০)
E.mail-ganabijnan@yahoo.co.in